দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবেশ রায় ও সমসাময়িক বাংলা ছোটগল্পকার

দেবেশ রায় স্বাধীনতা উত্তরকালে ছোটগল্প লিখেছেন, আজও লিখে চলেছেন। সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত প্রমুখ। লেখক হিসাবে দেবেশ রায় সমসাময়িক লেখক সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং এদের পাশাপাশি তিনি তাঁর গল্পে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গল্প সম্পর্কে অশ্রুকুমার সিকদার বলেছেন—

> ''গল্পের গল্পকে উপস্থাপনার নতুন নতুন প্রকরণ খুঁজে বেরিয়েছেন দেবেশ রায়, এই আধুনিক সময়ের সম্ভবত সবচেয়ে আধুনিক গল্পকার। বস্তুকে বস্তুর আকারে চিনে নিতে চান তিনি, আর তাই তাঁর গল্পে অনুপুঙ্খের এতো গুরুত্ব। গল্পের বাস্তবতাকে তাঁর গল্পের ভাষা স্বতন্ত্র স্তরে তুলে দেয়। ... দেবেশের মেধাবী গল্প অনেক সময় জ্যামিতিক প্রতিপাদ্যের মতো হতে পারে প্রায়।''[১]

ছয়ের দশকের মধ্যভাগে (১৯৫৫--এ প্রথম গল্প 'হাড়কাটা') যখন দেবেশ রায় বাংলা ছোটগল্পের জগতে প্রবেশ করেন তখন বাংলা ছোটগল্প যথেষ্ট পরিণত। এই সময় বাংলা ছোটগল্পের রীতি, বিষয়বস্তু প্রভৃতি পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। দেবেশ রায়ও চেয়েছিলেন প্রচলিত গল্প রচনার আঙ্গিককে পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ নতুন ধারার গল্প রচনা করতে। গল্পসমগ্র তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি জানান—

> ''ছোটগল্প নিয়ে আমার ভাবনার অভ্যাসটাকে বদলে ফেলতে চাইছিলাম, আয়ত্ত করতে চাইছিলাম একটা বড় কাহিনী, নানা রকম চরিত্র, নানা ধরণের সম্পর্ক, তথ্য তৈরী করে তোলা, তথ্য বিন্যস্ত করে ফেলা, বিস্তারের দিকে যাওয়ার বেগ, সংলাপের তৎপরতা।''[২]

তাঁর কথায়, এই সময় তিনি গল্প ছাড়া অন্য কোনো ধরণের লেখালেখির কথা

চিন্তাই করতেন না। প্রথমদিকের গল্পগুলিতে তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের বিশ্বস্ত বিবরণ এবং সুখ-দুঃখের সূক্ষ্ম বৈশিষ্টগুলি তুলে ধরলেও সেইসব গল্প ছিল প্রচলিত ছকের বাইরে। বিষয় এবং বিন্যাসেও অভিনব। আবার নামকরণের ব্যঞ্জনায়, সংলাপের সম্পূর্ণতায়, 'বানানের কত কৌশল, যতি চিহ্নের কত ব্যবহার, বাক্যগঠনে কত ভাঙন' ইত্যাদিতে গল্পগুলিকে তিনি অন্যরকম অবয়ব দান করতে চেয়েছেন। সমসাময়িক গল্পকারদের বাস্তবতার চিত্র থেকে তাঁর গল্পে বাস্তবতার মাত্রাও পৃথক।

পাঁচের দশক থেকে যাঁরা গল্প লেখা শুরু করেছিলেন তাঁরা দেশপ্রেম, আন্দোলন, বিপ্লব, চাকরি ইত্যাদি ছেড়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে, এমনকি নিজের পরিচয় এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক অস্থিরতার মধ্যে ভেসে চলেছিলেন। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকেই আসে বিষাদ, যা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পে জড়িয়ে থাকে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের ক্লান্তি হতাশার কথা থাকলেও অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করতে পারে না তাঁর চরিত্ররা। দিব্যেন্দু পালিত আগাগোড়া নাগরিক জীবন নিয়ে লিখে গেছেন। নাগরিক জীবনের সমস্যা, সংকট, নির্বেদ, কৃত্রিমতা প্রতিবাদহীন জীবনযাপনকে বিদ্রুপ করেছেন। এককথায় নাগরিক জীবনের নানান প্যারাডক্স ধরা পড়েছে তাঁর গল্পে। আবার এই সময়েরই মধ্যে গল্পে একটা ভিন্ন ধারা নিয়ে আসেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে জীবনের বিচ্ছিন্নতাবোধ যেভাবে তৈরি হয়েছিল দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প তা থেকে একেবারে পৃথক। দীপেন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের গল্প 'গ্রহণ' কিংবা 'বৃত্ত' -এ তিনি কিছুটা অগ্রজ গল্পকারদের অনুগামী। নিম্নবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত জীবনের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার কথনই ছিল তাঁর গল্পের মূল বিষয়। ছয়ের দশকের শেষদিকে দীপেন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের বাঁকবদল ঘটান। মধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে রক্তক্ষরণ যন্ত্রণা। আর সেই রক্তক্ষয়ী যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে দীপেন্দ্রনাথ রাজনীতিকে হাতিয়ার করেন। আমাদের আলোচ্য দেবেশ রায়ের গল্পেও রাজনীতির প্রসঙ্গ আছে। তাঁর গল্পেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিড়ম্বিত জীবনের পাশে ধরা পড়েছে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগের আকুলতা। কিন্তু যে রাজনীতির সঙ্গে তিনি প্রথম যৌবন থেকেই জড়িত সেই রাজনীতি তাঁর প্রথম দিকের গল্পে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। শুধু মধ্যবিত্ত জীবন নয়, নিম্ন-মধ্যবিত্ত কিংবা একেবারেই

নিম্নজ শ্রেণির চরিত্ররা এসে ভীড় করেছে তাঁর প্রথম দিকের গল্পে।

সুতরাং ছয়ের দশকেই বাংলা ছোটগল্পে এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে গল্পের উপকরণ এবং অবলম্বন যে একেবারেই নতুন তা কিন্তু নয়। এই সময়ের গল্পগুলিও যেন সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার গল্প। ছোটগল্পের উদ্ভব লগ্ন থেকে চারের দশক পর্যন্ত যে বাস্তবতা ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণ রূপে, ছিল গল্পের বিষয়বস্তুতে, চালচিত্রে, গল্পের আবহমণ্ডলে, বিভিন্ন সমস্যা-সংকট; আবার বাস্তবের মধ্যে কঠোর তথ্যমূলক সত্যতাও ছিল, ছিল কঠিনতা। কিন্তু ছয়ের দশকের মাঝামাঝিতে এসে সেই বাস্তবতা দেখা দিল কোনো কোনো লেখকের কাছে একটা 'দর্শন' রূপে। দেবেশ রায় তাঁর 'গল্পসমগ্র প্রথম খণ্ডের ভূমিকা' অংশে নতুন বাস্তবতার স্বরূপের একটা আভাস দিয়েছেন—

> ''বাস্তব যেন বহুবিচিত্র আকারের এক প্রান্তর— সেখানে নিজের ছায়া নিজে মাড়ানো যায় না। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সেই আয়াসে বস্তুকে বস্তুর আকার চিনে নেয়ার সেই চেষ্টায় কত নতুন প্রকরণ খুঁজে বেড়াতে তখন ইচ্ছে গেছে। ... বাস্তব যে-অভিজ্ঞতা বাস্তবকেই প্রধান করে তুলতে পারে, তার অভাবে, তখন লেখাগুলির ভিতর থেকে নিজেকে যত বিচ্ছিন্ন করে নিতে গিয়েছি, ততই জড়িয়ে পড়েছি।''[৩]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটিতে অন্তর্ভুক্ত 'তখন' শব্দটি বলতে দেবেশ রায় ১৯৫৫ খ্রীঃ থেকে ১৯৬১ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়কালকে বুঝিয়েছেন। এই সময়টি ছিল তাঁর 'গল্পসমগ্র' প্রথম খণ্ডের রচনাকাল। গল্প সমগ্রের এই প্রথম খণ্ডের গল্পগুলিতে দেবেশ রায় বাস্তবতার বহুরূপ চিত্র দেখিয়েছেন। মাত্র উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে লেখা 'হাড়কাটা' গল্পটি তার সার্থক উদাহরণ। গল্পের চরিত্র বলতে মাত্র চারটি—নানকু কাহার, তার স্ত্রী গাধুলি, একটি পাগল এবং একটি কুকুর। গল্পের নায়ক নানকু অর্থের অভাবে স্ত্রীর চাহিদা মতো একটি রূপোর হাঁসুলি কিনে দিতে পারে না। সারা দিনের কাজ সেরে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে সে। এরকম এক সন্ধ্যায় স্ত্রীর হাঁসুলির চাহিদা শুনে রেগে গিয়ে স্ত্রীকে ধাক্কা মারে এবং স্ত্রী কেঁদে গালিগালাজ করলে, ''নানকু উঠে গাধুলির চুলের গোছা ধরে টেনে ওর থলথলে মাংসল গালে নিজের সরু লিকলিকে আঙুলগুলোর দাগ বসিয়ে দিল।''[৪] পরের দিন যখন নানকু কাটা মাংস নিয়ে

দোকানে বসে, আর সামনে দেখতে পায় পিঠ কাটা কুকুরটা মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে আর পাগলটা কচুপাতার ডাঁটার রস চুষে চুষে কুকুরটার পিঠে কাটা জায়গায় লাগিয়ে দিচ্ছে তখন নানকুর ভিতর এক অনুতাপ সৃষ্টি হয়। লেখকের কথায়—

> ''ঐ দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বিড়ির ধোঁয়াটা বাইরের আকাশে একটু-একটু পাতলা হয়ে একেবারে মিলিয়ে যাবার মত নানকুর মনে গত রাত থেকে সঞ্চিত দুশ্চিন্তা, ক্রোধ, ধীরে অতি ধীরে পাতলা হয়ে এল। আর সেখানে জাগল কেমন এক অপরাধবোধ।''[৫]

নানকু ভাবে, কেনইবা গাধুলিকে শুধু শুধু মারতে গেল? কুকুরটাকে না মারলেই হত। তার আত্ম অনুশোচনা, 'শালা পাঁঠা কাটতে-কাটতে কশাই-ই হয়ে গেছে নানকু'। তার মনে পড়ে দশবছর আগেকার গাধুলির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনের কথা, প্রেমের কথা, ঘর বাঁধার স্বপ্ন। পরের দিন নানকু তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বাড়ি ফেরে। যে কুকুরটাকে আগের দিন ছুঁড়ি দিয়ে পিঠে মেরেছিল তাকে মাংস এনে দেয় আর খানিকটা মাংস স্ত্রীকে এনে দিয়ে ভালোবাসার মধুর কথা বলে। তারপর দশবছর ধরে দশটা বসন্তের সকালে যে রক্তাক্ত চোখে দিন কেটেছে আবার তা সম্পূর্ণতা পায়, ''সেই হাড়কাটা কশাই নানকু কাহার আর তারাপুর গাঁয়ের মোড়লের শ্যামলা মেয়ে গাধুলির প্রেম সম্মিলনে।''[৬]

গল্পটি বর্তমান পাঠক অসাধারণ মনে করতে না পারেন। কিন্তু যে সময়ে গল্পটি লেখা তখন লেখক তৃতীয় বর্ষের একজন ছাত্র মাত্র, সালটা ১৯৫৫। এর পূর্বে ত্রিশের দশক পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত চরিত্রের প্রাধান্য ছিল। চল্লিশের দশকে তেভাগা আন্দোলন, মন্বন্তরের আলোড়নে এসেছিল দরিদ্র কৃষকরা। আবার এই দরিদ্র কৃষকদের কোনো একজনকে নির্দিষ্ট করে চেনানোও হয়নি। কৃষকরা ছিল সমগ্র এক জাতিসত্তা, যার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল এক সংগ্রামী মনোভাব। আমাদের মনে পড়ে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঝলক' গল্পটি। ১৯৩৬ সালে কৃষক সভার শ্লোগান ছিল 'লাঙল যার জমি তার'। এরপর থেকে শুরু হয় কৃষকদের স্বার্থরক্ষার আন্দোলন—তেভাগা, তেলেঙ্গানা আন্দোলন ইত্যাদি। 'ঝলক' গল্পটিরও কেন্দ্রে রয়েছে সমগ্র কৃষক সমাজ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বারে বারে কৃষকদের আন্দোলনকে ব্যর্থ করেছিল ঠিকই কিন্তু নিঃশেষ করতে পারেনি। আবার একটু পরবর্তীতে লেখা 'ভাসান'

গল্পে এন্তাজুদ্দি, উকিলুদ্দি, মনিরুদ্দি, কফিলদ্দি—এরা ব্যক্তিগত সমস্যার সঙ্গে, পরস্পরের সঙ্গে যেমন লড়াই করেছে, তেমনি প্রকৃতির উদ্দামতার সঙ্গেও লড়াই করেছে। আর তাদের সংঘ শক্তির কাছে হার মেনেছে ঝড় ও মেঘনা নদীর ঢেউও।

দেবেশ রায় কিন্তু ছয়ের দশকের মাঝামাঝিতে এরকম সংঘবদ্ধতায় চরিত্র নিয়ে গল্প লিখলেন না। তিনি লিখলেন একটি নির্দিষ্ট পেশায় নিযুক্ত একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে। গল্পের নায়ক নানকু কাহার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের লাইসেন্সপ্রাপ্ত একজন কশাই। সে কোনো মতেই মধ্যবিত্ত জীবনের অভ্যস্ত জীবিকার বৃত্তিতে কাজ করে না। তবে দেবেশ রায় যে উচ্চবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের নিয়ে গল্প লেখেননি তা নয়। তাঁর গল্পে সবশ্রেণির চরিত্ররাই ভিড় করে। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত সত্তাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন বেশি করে। তাই এই একজনই এক বিরাট শ্রেণির প্রতিনিধিমূলক বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর গল্পে। অর্থাৎ কশাই নানকু কাহার একই সঙ্গে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি আবার বহু নানকু কাহারের একজন। গল্পটি আর এক কারণেও আমাদের কাছে বাস্তবতার নতুন স্বাদ এনে দিয়েছিল। দেবেশ রায়ের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে কশাই চরিত্র নিয়ে অনেক লেখাই হয়তো আছে কিন্তু মাংস-ব্যবসায়ী কশাইদের যে আবার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের লাইসেন্স পেতে হয় তা দেবেশের আগে কোনো লেখকই সচেতন করে দেননি।

আগেই বলা হয়েছে, দেবেশ রায় বাস্তবতাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। 'দুপুর', 'বেড়ালটির জন্য প্রার্থনা', 'দুঃসাময়িক' প্রভৃতি গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় বাস্তবতা কীভাবে সমসাময়িক লেখকদের থেকে তাঁর গল্পে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'দুপুর' গল্পটিতে দেখা যায় রবিবার অর্থাৎ ছুটির দিনে একটি পরিবারের পাঁচজন সদস্যের মধ্যে একটি উত্তপ্ত দুপুর কাটানো। মধ্যবয়সী বাবা-মা যতীনবাবু ও বেণুবালা এবং তাদের তিন সন্তানের মধ্যে দুই মেয়ে মায়া ও সতী এবং একমাত্র ছেলে মুকুলের ছুটির দিনে কীভাবে সবাই নিঃসঙ্গের মধ্যে সময় কাটান। প্রত্যেকেই তারা এই নিঃসঙ্গের মধ্যে মানসিক টানাপোড়নে জর্জড়িত। তাদরে প্রত্যেকেরই বিচ্ছিন্ন ভাব-ভাবনা মিলে মিশে যায় একটি বেহালার সুরের সঙ্গে—

''বেহালার সুর যে অন্য জগতের দরজাটা একটু-একটু খুলছিল, সেটা

আবার একটু-একটু করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।... পাঁচজন পাঁচজনের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে রইল। আর, মাটির বেহালাটা নিজের ছোট্ট দেহটিতে পাগলের মত ঝোড়ো সুরের আওয়াজ এনে যেন বিদীর্ণ হয়ে থেমে যাবার আয়োজন করছে।... হঠাৎ একটা ট্রাকের জান্তব আওয়াজে মাটির বেহালার সুরটা থেমে গেল।... সুর আর শোনা গেল না।''[৭]

গল্পটিতে কোনো ঘটনা নেই, পরিণামও নেই। বেহালার সুর যেমন এখানে দূরের ব্যঞ্জনার প্রতীক, তেমনি দুপুর সেই প্রতীকের আশ্রয়। দিনের মাত্র একটি ভাগকে নিয়ে দেবেশ রায়ের পূর্বে আর কোনো গল্পকার মনে হয় লেখেননি। গল্পটি দেবেশ রায়ের নতুন গল্পরীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি সফলতম নিদর্শন বলা যায়।

'বেড়ালটির জন্য প্রার্থনা' গল্পটি আত্মকথন রীতিতে রচিত। গল্পটি শুরু হয় কথকের এক চিরতৃষ্ণা নিয়ে, আদিম সভ্যতার পাশবিকতার তৃষ্ণা। যা থেকে একটি অবলাজীব বেড়ালের মৃত্যু ভাবনা তার কল্পনায় আসে। বেড়ালটির রক্তাক্ত মৃত্যু ভাবনার যে বর্ণনা কথক ভেবেছে তা কোনো সভ্য জগতের মানুষের পক্ষে ভাবা সম্ভব নয়। আসলে কথক চরাচরের একটি জীব হিসাবেই সে তৃষিত। তাই নিজের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য সে একটি মেয়ের বাড়ি যায়। তার কথায় পৃথিবীই তাকে টেনে এনেছে তৃষ্ণা মেটানোর জন্য একটি মেয়ের কাছে। কিন্তু সেই তৃষ্ণাকে আটকে রাখতে হয় সমাজের রীতিনীতির কাছে। আর এর থেকে সৃষ্টি হয় কথকের আক্ষেপ। কিন্তু ভালোবাসার তৃষ্ণা সেই আক্ষেপকে বিলীন করে দেয়। পাশবিকতার তৃষ্ণা মুছে গিয়ে ভালোবাসার তৃষ্ণায় কথকের মনের একটি প্রার্থনা ব্রহ্মসংগীতের সুরের সঙ্গে মিশে যায়—

''সেই বেড়ালটির দৃষ্টি থেকে দিনের অন্ধতা আর রাতের উন্মত্ততা মুছে যাক, সেই বেড়াল যেন শীতের রাতে একটা উনুনের পাশে ঘুমুতে, আর প্রদোষের স্নিগ্ধতায় জাগতে, পারে।''[৮]

দেবেশ রায় গল্পটিতে একজন মানুষের বহিঃপ্রকৃতির বাস্তবতা এখানে তুলে ধরেন নি। অন্তর্জগতের এক গভীর মানবিকতা সম্পন্ন বাস্তবতার কথা বলেন। এছাড়াও মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্রমুখী সম্পর্কের উদ্ভাস লক্ষ করা যায় তাঁর গল্পে। 'নাগিনীর উপমেয়'

গল্পে আর্থিক সংকটের সমস্যায় ভুগলেও ক্ষমতাবান এক যুবকের বিবাহ প্রস্তাবে রাজি নয় এক তরুণী। পরিবর্তে সে ক্ষমতাহীন, ব্যক্তিত্বহীন এক ছেলেকে স্বামী হিসেবে বেছে নেয়। কারণ নারীরা নাগিনীর উপমেয়। দেবেশ রায় এখানে নারীর সঙ্গে সাপের যে উপমা দিয়েছেন পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক লেখকদের রচনায় এর উল্লেখ থাকলেও উপমাটি এখানে ভিন্নধর্মী—

> ''নারীর সঙ্গে নাগিনীর একটা মিল প্রায়শই কল্পিত হয়ে থাকে, অনুপ্রাসটাই অবশ্য তার প্রধান কারণ। কিন্তু নারীর সঙ্গে যদি কারো তুলনা করতেই হয় তবে সে বাস্তুসাপ। কলা দাও, দুধ দাও, তুমি তাকে মান দেখিয়ে চলো, সে-ও তোমাকে মান দেখাবে। কিন্তু যদি একবার সম্মানের লেজে পা পড়ল—ফুঁসে উঠবে অমনি। মেয়েদের ফুঁসে ওঠার মত মহৎ দৃশ্য খুব কম আছে।''[৯]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী দাঙ্গা, মন্বন্তর, দেশভাগের ফলে মানুষের জীবনে নেমে আসে অস্তিত্বের সংকট। দেবেশ রায়ের 'দুঃসাময়িক', 'অপেক্ষায়', 'দাহনবেলা' প্রভৃতি গল্পগুলিতে অস্তিত্ব সংকটের দীর্ণ উচ্চারণ শোনা যায়। 'দুঃসাময়িক' গল্পটি প্রেম দিয়ে শুরু হলেও প্রেম ঠিক এর মূল বিষয় নয়। পুরাণের মিথ ব্যবহার করে গল্পকার দেখিয়েছেন, আমরা কীভাবে আত্মপরিচয়হীন হয়ে বেঁচে থাকি। 'অপেক্ষায়' গল্পটি প্রেমের গল্প কিন্তু প্রেমের সংকটের মূলে আছে মেয়েটির অসুস্থতা। 'দাহনবেলা' গল্পটির মূলেও আছে প্রেম কিন্তু গল্পটির যেমন শুরু কিংবা শেষ নেই তেমনি প্রেমিক- প্রেমিকার নেই কোনো নিজস্ব অস্তিত্ব। গল্পের তিন প্রেমিক তাদের প্রেমিকার কাছে মুক্তি চায়। দাহনবেলায় প্রেম একই সঙ্গে অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বের সংকট নিয়ে আসে। দেবেশ রায় কিন্তু এই জীবন সংকটেই থেমে যাননি। প্রেমের মধ্যদিয়েই তিনি এই অস্তিত্বের সংকট থেকে মুক্তির খোঁজ করেছেন। এই প্রেমই 'দুঃসাময়িক' গল্পে আত্মপরিচয়ের জন্য সামর্থ্য জোগায় আবার 'দাহনবেলা'য় তৃতীয় প্রেমিক পুরুষটি অনস্তিত্ব থেকে উত্তীর্ণ হয়।

জীবন যন্ত্রণা ও অস্তিত্বের সংকট নিয়ে সমসাময়িক গল্প লেখেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে দেবেশ রায় যে প্রেমের পথে অস্তিত্বের টানাপোড়েন দেখান, দীপেন্দ্রনাথ সেই পথে হাঁটেন নি। দীপেন্দ্রনাথের চরিত্রগুলির মধ্যে দেশভাগের যন্ত্রণা বেশি। গল্পগুলিতে

প্রেম নয়, অনেকটা পারিবারিক কিংবা নিজস্ব অস্তিত্বের সংকট আসে। যেমন, 'সানাই' গল্পে পঞ্চাশের দশকে এক ছাপোষা কেরাণি পরিবারের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। বৃদ্ধ কেরাণি তার পুত্রকে বড় করে সংসারের ভার এবং সংসারী দেখতে চেয়েছিলেন। 'সম্পর্ক' গল্পটি একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের আত্মসমীক্ষাকে কেন্দ্র করে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পের নায়িকা অরুন্ধতী চাকরি পায় ঠিকই কিন্তু বাড়িতে তার মা তার উপর বিশেষ নজরদারি রাখে। এর ফলে ছোট ছোট ঘটনা ও কথার মধ্যদিয়ে অরুন্ধতীর মানসিকতার বিশেষ প্রতিফলন ঘটে। সে খুঁজে বেড়ায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ভিত্তি কেমন? আত্মীয়তা, স্নেহ, প্রেম ইত্যাদি শব্দগুলিই বা কেন বাস্তবতাকে সর্বদা ঢেকে বেড়ায়।

বিপন্ন সময়ের বিচিত্র চেহারা ফুটে ওঠে দিব্যেন্দু পালিতের গল্পেও। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে বেশিরভাগ গল্পই কলকাতা শহরের সরকারী, বেসরকারী অফিসের মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ঈর্ষা, ইতরতা, বিপন্নতা উঠে আসে। 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ', 'লীভ ট্রাভেল', 'দাঁত', 'নিত্যগোপালের পুত্র লাভ', 'বিবেক', 'মুকাভিনয়', 'মানুষের মুখ' প্রভৃতি গল্পগুলিতে ব্যক্তি মানুষের অসহায়তা ধরা পড়ে। 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ' গল্পে কথক যুবক কিশোরী মুন্নির সঙ্গে ঘন্টা কয়েক কাটানোর পর বুঝতে পারে, তার নিজের কোনো পরিত্রাণ নেই, মুন্নির সঙ্গে আজকের এই দেখা হওয়াটাও যেন মিথ্যে। 'নিত্যগোপালের পুত্র লাভ' গল্পে নিত্যগোপালকে প্রমোশন দিয়ে অফিসের বস নিত্যগোপালের স্ত্রীর আমন্ত্রণে ঘনঘন তাদের বাড়িতে যায়। নিত্যগোপালের সন্তান ছিল না, তিন মাস ট্যুর থেকে এসে সে স্ত্রীর কাছে শুনতে পায়, 'তুমি কি চাও? ছেলে না মেয়ে?' নিত্যগোপাল কোনো প্রকার হতাশ হয় না বরং সে অন্ধকারেই হেসে বলে, 'ছেলেই তো ভালো—'। গল্পটিতে কোথাও কোনো স্পষ্ট করে অবৈধ সম্পর্কের কথা বলা নেই, পাঠক ইঙ্গিতেই সবকিছু বুঝে নেন নিত্যগোপালের জীবনের অসহায়তা।

সমকালীন আর এক গল্পকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পেও এই বিপন্ন সময় উঠে এসেছে। তাঁর কবিতায় যে রোমান্টিকতা ধরা পড়ে ছোটগল্পে সেই রোমান্টিকতার আভাস থাকলেও সমাজমনস্কতা এবং সময়চেতনা প্রবলভাবে গ্রাস করেছে গল্পগুলিতে। 'মনীষার দুই প্রেমিক' গল্পে রোমান্টিকতার ছড়াছড়ি থাকলেও 'খরা', 'প্রতিশোধের একদিক', 'বিজনের

বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য', 'স্বর্গ দর্শন', 'শাজাহান ও তার নিজস্ব কাহিনী' প্রভৃতি গল্পে সময়চেতনা কিংবা সমাজমনস্কতাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। 'বিজনের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য' গল্পে দেখা যায় বিজন প্রশ্ন করে সে কি সারাজীবন ধাক্কাধাক্কি খেয়ে বেঁচে থাকতে নাকি এইরকম জীবন ত্যাগ করে অন্যরকম জীবন খুঁজে বেঁচে থাকবে? 'শাজাহান ও তার নিজস্ব কাহিনী' গল্পের হাজু, ভালো নাম শাজাহান। সহজ, সরল গ্রামের মানুষ যেরকম হয় তেমনি সে। হাজুর ভাগ্য তার সঙ্গে থাকে না। হাটে বাজারে ব্যাপারীদের মধ্যে মারপিঠ লাগলে কারো কিছু হয় না। তারই মাথা ফাটে, ক্ষ্যাপা ষাড়টাও তাকে গুঁতো মারে, জলঢোঁড়া সাপটিও তাকেই দংশন করে। তালগাছ থেকে পড়ে গেলে সবাই তাকেই অবহেলা করে। কিন্তু হাজু কারো কোনো কথার উত্তর দেয় না। সে খোলা আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। কলকাতা শহরের চকচকে শাদা দেয়াল তার ভালো লাগে। সেই দেয়াল দিয়ে নেমে আসা লাল পিঁপড়ের সারি দেখে সে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। এরকম অন্যমনস্ক চরিত্র সুনীলের ছোটগল্প ছাড়া অন্য কোনো লেখকের গল্পে পাওয়া খুব কম যায়।

ভালোবাসার মুক্তাঙ্গণে সবাই সবাইকে ভালোবাসবে এমন একটা দুর্বার আকাঙক্ষা সুনীলের গল্পে একটা বিশেষ চরিত্র হয়ে উঠেছিল। তেমনি ভালোবাসার একটা বিশুদ্ধ রূপও সুনীলের গল্পে পাই। ভালোবাসা হলে একতরফা দিয়ে যায় পাবার প্রত্যাশা করে না। 'মনীষার দুই প্রেমিক' গল্পে মনীষাকে ভালোবাসে বরুণ। সে নিজেকে মনীষার অযোগ্য মনে করে। তাই মনীষার আরেক প্রেমিক অমলকে সে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। অমল মনীষার কাছ থেকে সরে যেতে চাইলে বরুণ তাতে বাধা দেয়। বরুণ অমলকে জানায় যে মনীষার এত অপমান করতে পারে না। এ পৃথিবীতে আর একজনও যোগ্য প্রেমিক নেই মনীষার আবার অমল মনীষার কাছ থেকে সত্যি সত্যি সরে গেলে বরুণকেই যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। প্রেমিকাকে দূর থেকে দেখার এই তৃপ্তিকে সুনীল বড়ো চমৎকার করে দেখেছেন। দেবেশ রায়ের গল্পেও এরকম প্রেমিক মানুষের পরিচয় পাই। 'নাগিনীর উপমেয়' গল্পে এই গল্পে অরুণ বসু উদ্বাস্তু প্রতিমাকে চাকরি পেতে সাহায্য করেছে। তার নানান সমস্যা হলে সমাধান করতে সাহায্য করেছে। প্রতিমা অরুণ বসুর সঙ্গে দু'বছর প্রেমও করেছে কিন্তু তাদের বিয়ের আগের দিন প্রতিমা যোগ্য অরুণ বসুর সঙ্গে যায় অযোগ্য মাস্তান ছোকরার

সঙ্গে অন্ধকারে নিবিড় হয়ে বসে থাকে। তা দেখতে পায় অরুণ বসু। সেখান থেকে পালিয়ে যায় প্রেমিক অরুণ। প্রতিমা অরুণ বসুর উপর কর্তৃত্ব করতে পারবে না বরং অযোগ্য মাস্তান ছেলেটির উপর কর্তৃত্ব করতে পারবে এই ভেবেই প্রেমিক অরুণ বসুর কাছ থেকে সরে আসে। এখানেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের সঙ্গে দেবেশ রায়ের গল্পের মিল ও অমিল।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ও গল্পে এক বিপন্ন সময়ের কথা বলতে চেয়েছেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে মানুষের মধ্যে যে ব্যর্থতা, হতাশাবোধ সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর গল্পগুলি। 'নীলুর দুঃখ', 'পটুয়া নিবারণ' প্রভৃতি গল্পগুলিতে তৈরি হয়েছে এক অস্তিত্বের টানাপোড়েন। নীলু পাড়ার যুবক ছেলে। পাড়া প্রতিবেশীদের কথায় সে সবছেলেদের— পোগো, জগু, জাপান, ছটকু, এমনকি বৃটিশের মায়ের সন্দেহ তার ছেলেকে নীলুই নষ্ট করেছে। কিন্তু এসব কথায় নীলুর কোনো যায় আসে না। একদিন ফুল বাগানের মোড় থেকে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ নীলুর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। তার মনে পড়ে পুরনো প্রেমের কথা। শোভন আর বল্লবীর ভালোবেসে বিয়ে হল কিন্তু তার সঙ্গে কুসুমের বিয়ে হল না কেন? তার বাবা কেবল নিজের সুখের কথাই চিন্তা করে আর মা, ভাইবোনেরা তাকে তেমনভাবে স্নেহ-ভালোবাসে না। এক নিশুত জ্যোৎস্না রাতে নীলু তার বন্ধুকে এসব কথা বলতে থাকে আর সিগারেট টানে। 'পটুয়া নিবারণ' গল্পের নায়ক নিবারণ কর্মকার চেয়েছিল বিয়ে করে সুখে থাকবে। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে তার মিল কম। হিংস্র প্রকৃতির ছবি আঁকত সে। একবার দুটে ভয়ঙ্কর কালসাপ পরস্পরকে জড়িয়ে আছে এমন ছবি এঁকেছিল সে। তা দেখে তার স্ত্রী ভয় পায়। গল্পটিতে ব্যক্তি নিবারণকে গ্রাস করেছে তার শিল্পীসত্তা ও শিল্পকর্ম। আসলে এটাই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শিল্পগুণ। তিনি এক অস্থির, বিপন্ন সময়ের ছবি তুলে ধরতে চান আমাদের সামনে।

দেবেশ রায়ের বহু গল্পের বিষয় মৃত্যু, মৃত্যুর বর্ণনা কিংবা মৃত্যু বিষয়ক চিন্তা। 'জলধর ব্যানার্জির মৃত্যু', 'কলকাতা ও গোপাল', 'পা' প্রভৃতি গল্পগুলিতে রয়েছে চরিত্রগুলির ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতা থেকে সৃষ্টি হয় অপ্রাপ্তি এবং তা থেকে হতাশা। আর এই হতাশা থেকে গল্পের চরিত্ররা মৃত্যুর দিকে ঝুঁকে পড়ছে। 'জলধর ব্যানার্জির মৃত্যু' গল্পে জলধর বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোক। অফিসে চাকরি করেন, নিজের হাতে বাজার করেন। কিন্তু তার মনের ভিতর কাজ করে এক অসার্থক যাপিত জীবন। সফল মঞ্চাভিনেতা ছিলেন। 'সীতা' নাটকে তারা, 'আলমগীরে' উদিপরী, 'জনা'য় জনা, 'নরনারায়ণে' দ্রৌপদী সেজে মঞ্চ কাঁপাতেন। কিন্তু রাতের স্বপ্ন আর জাগরণের মাঝখানে এক মঞ্চের আলো-আঁধারিতে ঘুরপাক খেয়েছেন। তারপর তার মৃত্যু হয় এবং 'বেঁচে ছিলাম' এই কথাটি যেন মৃত্যুর মধ্য দিয়েই ঘোষণা করে ছিলেন। 'কলকাতা ও গোপাল' গল্পে এক সাধারণ ছেলে গোপাল মফঃস্বল থেকে কলকাতায় এসে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু পরিবারের সঙ্গে দ্বান্দ্বিকতা, চারপাশের প্রতিকূল পরিবেশ, কলকাতা শহরের হঠাৎ ধনী ব্যক্তিদের অর্থসম্পদে লোভ—এসব চিরকাল তার মনের মধ্যে এক বিষণ্ণতা এনে দিয়েছিল। যার ফলে সে নিজেই জানে না ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে কীভাবে এগোচ্ছি সে। গাড়িয়াহাট মোড়ে ওভারব্রিজের কাছে আত্মহননের জন্য যায়। একসময় ব্রিজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর এক চলমান গাড়ির ধাক্কায় সে মারা যায়।

আমাদের মনে পড়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু', 'চারুলালের আত্মহত্যা', 'মুনিয়ার চারদিক' প্রভৃতি গল্পগুলির কথা। 'স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু' গল্পের নায়ক মাখনলাল একটি অফিসে চাকরি করে। একদিন অফিসে অনেকক্ষণ ধরে জরুরি কাজ করার পর সে নিজেকে জ্বরাগ্রস্থ মনে করে। হঠাৎ তার কি মনে হয়, সে নিজের ওজন মাপার জন্য যন্ত্রের দিকে এগোয়। কিন্তু ওজন তার দৈর্ঘ্যের অনুপাতে কম হওয়ায় তার মধ্যে বিষণ্ণতা আসে। আর এই ওজন যন্ত্রের ভিতরে একটি টিকিটে তার ভাগ্য লেখা থাকে—খুব শীঘ্রই সে বিপদে পড়ে। সেদিনই রাত্রে যখন প্রথম কুকুর ডাকতে থাকে তখন মাখনলাল হাল ছেড়ে দেয়। সে বুঝতে পারে যে, ধীরে ধীরে মৃত্যু তাকে গ্রাস করছে। 'মুনিয়ার চারদিক' গল্পে সাপের কামড়ে ছোট্ট মুনিয়ার মৃত্যুতে চারদিক বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। পরাগ আর বড়ো হতে চায় না, সুবিনয় সারাক্ষণ লাঠি হাতে বাগানে সাপটার খোঁজ করে। একদা যে লোকটা কারখানার শ্রমিকদের নেতা হয়ে ওঠে, কার্লমার্কসকে পরমপুরুষ বলে মনে করেছিল সে আজকে ব্যক্তিগত দুঃখশোকে স্বীকারোক্তি করে, 'আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতুম আমার মুনিয়াকে। আর কিছুকে নয়, আর কাউকে নয়। আমার এ অপরাধ

ক্ষমা কোরো'। 'চারুলালের আত্মহত্যা' গল্পে চারুলাল যখন আত্মহত্যা করে হিরণ তখন নানা ভাবনার মধ্যে নিজেও মৃত্যু ভাবনার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

তবে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মৃত্যু বিষয়ক গল্প লিখলেও মৃত্যু থেকে উত্তরণের ইঙ্গিতও দিয়ে গেছেন। মৃত্যু সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ''আসল কথা, মৃত্যু আমার ফিলজফি হতে পারে না। তাছাড়া আমি মৃত্যুর জয়গান গাইব কেন? একসময় মৃত্যু হয়তো আসবে, একটা যতিচিহ্ন। তবে এটাকে জয় করার জন্য আমাদের প্রয়াস থাকা দরকার।''[১০] তাই 'উত্তরের ব্যালকনি', ' শেষ চান্স', 'তৃতীয় পক্ষ' প্রভৃতি গল্পগুলিতে শীর্ষেন্দুর আশাবাদী মনোভাব দেখা যায়। ' শেষ চান্স'-এ সঞ্জয়ের অসুখ হলেও শেষ পর্যন্ত তা সেরে যায়। বিষণ্ণতার মধ্যেও 'উত্তরের ব্যালকনি' গল্পে তুষার ও কল্যাণী বেঁচে থাকে। অপরদিকে 'তৃতীয় পক্ষ' গল্পটিতে কণিষ্ক ভালোবাসতো মলিকে আর শম্পা ভালোবাসতো সুজনকে। কিন্তু তাদের এই ভালোবাসা পরিণতি পায়নি। বরং উল্টো হয়, কণিষ্কের সাথে বিয়ে হয় শম্পার। যতই তৃতীয় পক্ষের প্রবেশ ঘটুক না কেন শেষে কণিষ্ক ও শম্পার ভালোবাসার নিরালা ঘরটি বড় সুন্দর হয়।

অপরদিকে দেবেশ রায়ের গল্পে মৃত্যু থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত নেই। পরিবর্তে আছে একজন অতি সাধারণ মানুষ কীভাবে মৃত্যুর মধ্যদিয়ে অসাধারণ হয়ে ওঠে। 'জলধর ব্যানার্জির মৃত্যু' গল্পে জলধরের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ থাকলেও তার শখ ছিল অভিনয়। এই শখের অভিনয়েই সে স্বপ্নের লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছিল। অর্থাৎ লেখক প্রতিদিনের ব্যস্ততার মধ্যে চরিত্রগুলিকে রাখতে চাননি। চরিত্রগুলিকে প্রাণ ধারণের জন্য অতিরিক্ত একটি পরিসর দিয়েছেন। তাইতো, ''সূর্য যখন উঠছিল, জলধর বাঁড়ুজ্জে নামক সাতান্ন বৎসর সেই ভদ্রলোক দ্রৌপদীর মত গরিমায়, তারার মত তেজে, সীতার মত সাহসে, জনার মত মত্ততায় ও উদিপুরীর মত ঔদাস্যে—মরে গেলেন।''[১১] আবার 'কলকাতা ও গোপাল' গল্পের নায়ক গোপাল যখন আত্মহত্যা করতে যায় তখন ব্রিজ থেকে নিচে পড়ার মাঝের সময়ে অসহায় গোপালের ভাবনা 'আমার মরার কোনো মানেই হয় না'। 'পা' গল্পে আত্মহত্যার কথা থাকলেও বড় বৌয়ের মৃত্যু দেখে ছোট বৌ আত্মহত্যা না করে পালিয়ে আসে কিন্তু একটি পা তার কাটা পড়ে। লেখক গল্পে বৌ দুটির আত্মহত্যার কারণ ব্যাখ্যা করেননি বরং এক পা

নিয়ে ছোট বৌ কীভাবে আবার আগের সংসারে টিকে থাকতে চেয়েছে এবং পেরেছে তাই দেখিয়েছেন।

দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, নতুন কলোনিতে এসে বসবাস, বেকার সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দেবেশ রায় কয়েকটি গল্প লেখেন—'নাগিনীর উপমেয়', 'উদ্বাস্তু', 'সাত হাটের হাটুরে', 'জয় যাত্রায় যাও হে', 'জননী! জন্মভূমি!!' ইত্যাদি। দেশভাগের বিপন্নতায় লেখা দেবেশ রায়ের প্রথম গল্প 'নাগিনীর উপমেয়' (১৯৫৭)। দেবেশ রায় দেশভাগের কঠিন, গভীর অভিজ্ঞতাকে নতুন করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন এই গল্পটিতে—

> ''প্রতিমারা শিলিগুড়িতে এসেছিল সাতচল্লিশ সালে। বাবা আগেই মারা গিয়েছিলেন, বড়ভাই পাকিস্তান জেলে। শিলিগুড়ি কলোনিতে প্রতিমা থাকে বিধবা মা আর ছোট দুই ভাইবোনকে নিয়ে। ওর ওপরই সংসারের ভার।''[১২]

এই বিপন্নতায় প্রতিমা হা-করা অভাবেরর সংসারে সবার মুখে গ্রাসাচ্ছদন করতে কোনোমতে একটা চাকরি পেতে চায়। আর যুবতী প্রতিমার মন পেতে উদ্বাস্তু কলোনির ক্ষমতাবান সম্পাদক অরুণ বসু এগিয়ে এসেছিল চাকরির দাতা হিসেবে। ক্রমে অরুণ প্রতিমার প্রণয় প্রার্থী, এমনকি বিয়ের পাত্র পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু বিয়ে হয়নি। বিয়ের আগের রাতে অন্ধকারে উদ্বাস্তু কলোনির মাস্তান এক ছোকরার সঙ্গে প্রতিমাকে দেখতে পায় অরুণ। অরুণ মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। তাই প্রতিমার সঙ্গে দেখা না করে পালিয়ে আসে। গল্পটির অন্তরঙ্গে রয়েছে দেশভাগ এবং তা এতটাই গভীরে প্রোথিত যে তা প্রায় অস্ফুট বলে মনে হতে পারে। ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন এবং প্রব্রাজনের সংক্ষোভও ভুলিয়ে দিতে পারে না ফেলে আসা এক জীবনের সম্ভ্রম আর আত্মমর্যাদাবোধ। তাই নাগিনীর ফুঁসে ওঠার মতো সেই সম্ভ্রম মাথা চারা দিয়েছে বলেই অরুণ পালিয়ে এসেছে প্রতিমার কাছ থেকে।

১৯৫৭ সালেই দেশভাগের বিপন্নতাকে কেন্দ্র করে দেবেশ রায় আরেকটি গল্প লেখেন 'সাত হাটের হাটুরে'। এই গল্পের নায়ক একটি তেরো বছর বয়সের বালক, নাম সাধন। পিতৃহীন সাধন দেশভাগের সময় তার মা-ভাই-বোনকে সঙ্গে নিয়ে দিদি-জামাইবাবুর

সাথে উত্তরবঙ্গে চলে আসে। সংসারের অভিভাবক বলতে জামাইবাবু। কিন্তু দিদি আর জামাইবাবু একদিন তিস্তার অপর পাড়ে কাজ খুঁজতে গেলে দিদি একাই ফিরে আসে। সেই থেকে পরিবারটি আবার অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। পরিবারের সম্পূর্ণ ভার এসে পড়ে সাধনের ওপর। সাধন ভোরবেলায় বাড়ি থেকে বের হয়ে পান-বিড়ি- সেফটিপিন-লেবেঞ্জুস ফেরিওয়ালা করে। ছোট্ট সাধন রাত একপ্রহর থাকতেই ঘুম থেকে ওঠে, তারপর সারাদিন সাত হাট ফেরিওয়ালা করে ঘুরতে ঘুরতে বাড়ি ফেরে রাত এগারোটায়, কোনোদিন বা রাত একটায়। বাড়ির কারো সাথেই তার প্রায় দেখা হয় না। মা-ভাই-বোন ঘুমন্ত অবস্থায় থাকতেই সে বের হয় আবার যখন রাতে বাড়ি ফেরে তখন তারা ঘুমিয়ে পড়ে। একমাত্র স্বামী পরিত্যক্তা দিদিই তাকে ভোরবেলায় ঘুম থেকে ডেকে দেয় আবার রাত্রে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকে। সাধনও দিদির দুঃখকেই বড় করে দেখে। তাই সারাদিনের হাড়-ভাঙা খাটুনি তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। দিদির পরনে শাড়ি নেই বলে সে মহাজনের পাওনা টাকা ফাঁকি দিয়ে দিদিকে শাড়ি কিনে দেয়। দেশভাগের ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে অনেক লেখকই গল্প লিখেছেন কিন্তু ১৯৬২ তে দেবেশ রায় যে 'উদ্বাস্তু' গল্পটি লিখলেন তা এক নতুন আখ্যান, নতুন ছোটগল্পের আকার নিল। গল্পটিতে রয়েছে আইডেনটিটির ক্রাইসিস। দেশভাগের ফলে যারা দেশছাড়া হয়েছে এবং সীমান্তবর্তী শহরগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে এমন মানুষদের আইডেনটিটি সঠিক কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য সরকার থেকে কেন্দ্রিয়ভাবে নির্দেশ পড়ে। এই সংস্থার আবিষ্কৃত তথ্যে অনেক মানুষই পরিচয়হীন হয়ে পড়ে। গল্পে সত্যব্রত আর অণিমা—দু'জনেই স্বামী-স্ত্রী। পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে প্রশ্ন ওঠে, সত্যব্রত কি সত্যিই সত্যব্রত? অণিমা কি সত্যিই অণিমা? পূর্ববঙ্গে এনামূল হক চৌধুরীর সঙ্গে কুমকুম নামের যে মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল, অণিমা আর সে কি অভিন্ন? যদি তাই হয় তবে এই বিয়ে কি দুই পক্ষের ক্ষেত্রেই প্রেম সম্পর্কিত ছিল, না কি এনামূল হক জোর জবরদস্তি করেছিল? অণিমা কিংবা কুমকুমের গর্ভজাত কন্যা অঞ্জনার পিতৃত্বের দাবি কে করতে পারে? এইসব প্রশ্নের কোনো উত্তর মিলে না। আর এখানেই গল্পটি শেষ হয়। কিন্তু প্রশ্নগুলি মানুষ সম্পর্কে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের দাবি করে। যতদিন না পর্যন্ত সোজাসুজি এই

প্রশ্নগুলির সত্য জবাব পাওয়া না যাচ্ছে, ''ততদিন যাকে আপনি স্ত্রী বলে জানেন, তিনি আপনার স্ত্রী নন; যাকে আপনাদের সন্তান বলে জানেন, সে আপনাদের সন্তান নয়।''[১৩] তাই গল্পে দেখা যায়, ভাঙা জীবনকে জোড়াতোড়া দিয়ে, হাজারো বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে সত্যব্রত আর অণিমা গড়ে তুলতে চেয়েছিল এক নতুন জীবন। বিশ্বব্যাপী যে 'খাঁটি ব্যক্তির সন্ধান' নামক কর্মসূচী তাদেরকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছে, সেখানে তারা আবার নতুন করে আত্মপরিচয়হীন উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়।

দেশভাগের পর ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় যখন মানুষজন আসতে শুরু করে তখন সবাইকে উদ্বাস্তু সার্টিফিকেট দেওয়া হত। কিন্তু নিয়মানুযায়ী এক মুসলমান উদ্বাস্তু হতে পারে না। কারণ, দেশভাগের সময় পাকিস্তানী মুসলিমরা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করত বলে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল। যে মুসলমিরা অন্য জাতির উপর অত্যাচার চালাত তারা কেন উদ্বাস্তু হতে যাবে। সেই অনুযায়ী 'জননী! জন্মভূমি!!' গল্পের কথকও মুসলিম হওয়ার কাররে পশ্চিম বাংলায় সার্টিফিকেট পায়নি। সে ভিটে মাটি ছেড়ে কলকাতায় এসে কলকাতাকে নিজের দেশ ভাবত, কলকাতাকেই নিজের প্রতীক ভাবত। গঙ্গা নদীকে আপন ভাবত। কিন্তু সার্টিফিকেট না পাওয়ায় তার সব স্বপ্ন ভেঙে যায়। সে আত্মপরিচয়হীন হয়ে পড়ে, দেশহীন হয়ে পড়ে। তার কথায়—

> ''আমার কোনো দেশ নেই। পূর্ব বাঙ্‌লা সরিয়তি শাসনের কল্যাণে আমার বিদেশ। পশ্চিম বাঙ্‌লায় আমি একটি নম্বর, একজন উদ্বাস্তু— আমার দেশ কোথায়, না জানা পর্যন্ত আমার পক্ষে কোনো একটি মানুষের অনুগত হওয়া সম্ভব নয়। 'জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে'—এ-আত্মপরিচয়েও মানুষ বাঁচতে পারে। বাঁচতে পারে না দেশহীনতায়।''[১৪]

লোকটি আইডেনটিটির ক্রাইসিসে ভোগে। তাই একসময় সে আত্মহত্যার পরিকল্পনা করে। কিন্তু 'শরিয়তি শাসনের দেশ থেকে গণতন্ত্রের দেশে আসা এক উদ্বাস্তু—আমার আত্মহত শবদাহ হবে কোন্ রীতিতে?'—এই প্রশ্নে সে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তাই আত্মহত্যার পূর্বে সে একটি ছবি আঁকতে চায়। ছবিটির নাম দেবে 'পৃথিবী, ১৯৬৫!' এবং ছবিটি জাতিপুঞ্জে পাঠাবে নিখিল উদ্বাস্তু বৎসরের মূল পোস্টার করার জন্য।

দেশভাগের পর বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তুঙ্গে উঠে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিধ্বস্ত মানুষজন অন্ধকারকে তুচ্ছ করে পালিয়ে আসে আর এক স্বপ্নের দেশে, নির্ভয় নিশ্চিন্ত জীবনের আশায়। কিন্তু এখানে এসেও তারা ঠাঁই পায় না, পায় না স্থায়ীভাবে বসবাস করতে। দেশে লোভী, ভণ্ড নেতাদের হাতে মার খেতে হয় তাদের। এরকমই গল্প লিখেছেন দেবেশ রায়ের সমসাময়িক গল্পকার দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রফুল্ল রায়। দীপেন্দ্রনাথের প্রথম গল্প 'আমার দেশের মানুষ'। দেশবিভাজন, উদ্বাস্তু সমস্যার নানাদিক ও ক্ষেত্র, মানবতাবোধ ইত্যাদির বৈপরীত্যে মানবতাবিরোধী ভণ্ড নেতাদের স্বরূপ ধরা পড়ে গল্পটিতে। দেশবিভাগের ফলে ওপার বাংলা থেকে এসে শেয়ালদা স্টেশনে ভীড় জমায় উদ্বাস্তুরা। সেখানে এক রোগা-পটকা ছেলে মার খায় এক ষণ্ডামার্কা লোকের হাতে। এ সময় একজন জনকল্যাণ ব্রতী শ্রমিক নেত্রী উপস্থিত হন সেখানে। ছেলেটি আশ্রয়ের খোঁজে নেত্রীর পায়ে পড়ে। কিন্তু নেত্রী নিজের ইউনিয়ন বাঁচাতে ছেলেটিকে সরিয়ে দেয়। নেত্রীর প্রকৃতস্বরূপ যে জনকল্যাণ নয় তা ধরা পড়ে। আর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন কুলি এদৃশ্য দেখে জ্বলে ওঠে। কিন্তু কিছু করতে পারে না। শুধু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে 'সাম্যবাদ' প্রতিষ্ঠা করবে সে। গল্পটিতে একই সঙ্গে যেমন অপমান এবং পরাজয়ের চিত্র ধরা পড়ে, তেমনি মানবিক শক্তির জয়ও ঘোষিত হয়।

এরকম গল্প দীপেন্দ্রনাথের আরো আছে—'ডাক', 'শঙ্খ', 'কান্না', 'মুক্তি' ইত্যাদি। 'ডাক' গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চিত্র আছে। দাঙ্গার পর মানুষ আবার স্বপ্নের পরীর খোঁজে বের হয়। মইনুদ্দিন নিজেকে টিকিয়ে রাখে মেয়ে ফতেমার কিংবা বুড়ো চাচার জীবনের নিষ্ঠুর পরিণতির বিনিময়ে। এখানেও মারামারি শেষ নেই। পথি মধ্যে গ্রাম্য স্কুল মাস্টারের শবদেহ দেখতে পায় সে। থমকে যায়, ভাবতে থাকে এ কোন্ স্বপ্নালোকে এসে পৌঁছেছে সে? তখনই তার সঙ্গীরা ফিরে আসার জন্য ডাক দেয়। সেই ডাকেই সব বাধা বিপত্তি পেরিয়ে সে অতিক্রম করবে নতুন পৃথিবীর উদ্দেশ্য যাত্রায়। 'শঙ্খ' গল্পে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ—বিদেশী শক্তির আক্রমণ, বঙ্গভঙ্গ বা ভারতবর্ষে দখল, সমাজ-সংস্কার তথা সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৭-এর বঙ্গভঙ্গের ও তৎসঙ্গে দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও সংকট এবং তা থেকে উত্তরণের চিত্র ধরা পড়েছে।

স্বদেশভূমি থেকে উৎখাত হয়ে কি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে এদেশে এসে উদ্বাস্তুরা নতুন কলোনি গড়ে তুলেছে। সেই কলোনি থেকে আবার বিতাড়িত করার প্রয়াস এবং প্রবল প্রতিরোধের উদ্যোগ গ্রহণ ও সফলতা অর্জন। 'মুক্তি' গল্পে এক চাষীর ছেলে চরণ দেশ-বিদেশ ঘুরতে চায়। কিন্তু দাঙ্গার ফলে তার স্বপ্নের দেওয়াল ভেঙে যায়। মাকে হারিয়ে ফেলে, পাগল বাবাকে নিয়ে আশ্রয় নেয় শেয়ালদা স্টেশনে। এমন সময় পুলিশের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে তার বাবাও মারা যায়। সে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে হঠাৎ বন্ধু সিরাজুলের সঙ্গে তার দেখা হয়। তারপর বাল্যবন্ধু সিরাজুলের হাত ধরে অনির্দিষ্টের পথে মিলিয়ে যায়। গল্পটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা হলেও চরণ যখন সিরাজুলের হাত ধরে নতুন পথে এগিয়ে যায়, তাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবিও ফুটে ওঠে। 'কান্না' গল্পের বিষয়বস্তুতে রয়েছে দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় আসা এক পরিবারের কথা। পরিবারটির কন্যা বস্তিবাড়ি থেকে নিখোঁজ, বৃদ্ধা ঠাকুমা দাঙ্গায় মারা যায়। এরকম অবস্থায় বড় ছেলে কলকাতায় এসে যে স্বপ্ন দেখেছিল তাতে সে আশাহত হয়। কলকাতাকে কলকাতা বলে সে আর মেলাতে পারছে না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশভাগ যে মানুষকে শুধু গৃহহীনই করেছে তা নয়, শিক্ষা-সংস্কৃতি-রুচি থেকেও নির্বাসিত করেছিল।

দেশবিভাগের ফলে ছিন্নমূল মানুষের বেদনার কথা পাওয়া যায় প্রফুল্ল রায়ের 'যেখানে সীমান্ত নেই', 'কাছেই আছে' গল্পে। দীপেন্দ্রনাথ, দেবেশ রায় যেখানে দেশবিভাগের ফলে ছিন্নমূল মানুষের স্থান দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে, বৃহত্তর অর্থে ভারতবর্ষে। প্রফুল্ল রায় তার পরিসর বাড়ান। 'যেখানে সীমান্ত নেই' আর 'কাছেই আছে' গল্পটির পটভূমি বিভাজিত ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান। ভারত এবং পাকিস্তানে একই পরিবারের মানুষদের কষ্ট, বেদনা আর ভারত এবং বাংলাদেশে থাকা সম্পত্তি বদলাবদলি করে নেওয়া দুটি হিন্দু-মুসলিম পরিবারের সৌহার্দ্য গল্প দুটির বিষয়বস্তু। 'যেখানে সীমান্ত নেই' গল্পটি আলোচনা করলে দেখা যায়। একান্ন বছর পর একটি ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণির কামরা থেকে আলতাফ ভয়ে ভয়ে ভারতের আজিমাবাদ স্টেশনে নামে। এর আগে দেশভাগের দুই বছর পর প্রথমে তারা চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে। দীর্ঘকাল করাচিতে বাস করার পর ভারতবর্ষে আলতাফের আগমনের কারণ দুটি—বড় বোন ফতিমার সঙ্গে দেখা করা এবং

আজমীর শরিফে যাওয়া। কিন্তু দেশভাগের আগে আজিমাবাদে দাঙ্গা হয়েছিল। তাদের বাড়িতে আগুন লেগেছিল। তাই তাকে বারবার হুঁহিয়ারি দিয়েছিল যে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের বিশেষ করে পাকিস্তানিদের পক্ষে নিরাপদ নয়। সব কিছু পিছনে ফেলে সে দিদির দেখা পায়। দিদি-ভাই দু'জনেই আবেগে বিহ্বল। 'কাছেই আছে' গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র মুনির। বাংলাদেশি মুসলিম যুবক। দেশবিভাগের পরে তার ঠাকুরদা আর কলকাতার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী নিজের নিজের বাড়ি বদলাবদলি করে নিয়েছিলেন ঢাকায় আর কলকাতায়। মুনিরের ঠাকুরদা ইন্দ্রনারায়ণকে চিঠি পাঠিয়েছেন—তার নাতি মুনির পূর্বপুরুষের ভিটে মাটি দেখতে যাচ্ছে। ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে গল্প করে মুনির। ইন্দ্রনারায়ণ পুরনো দিনের নগর কলকাতার বৃত্তান্ত শোনায় মুনিরকে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পে যেসকল লেখক দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে ছোটগল্প লিখেছেন তাঁদের মধ্যে ভিন্নধারার ছোটগল্প লিখেছেন একমাত্র দেবেশ রায়ই। দীপেন্দ্রনাথ দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে যেসকল ছোটগল্প লিখেছেন সেগুলি সমসাময়িক, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে তার মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য গুরুত্ব পেয়েছে। গল্পগুলি যেমন বর্ণনাধর্মী, তেমনি ঘটনাবহুল। গল্পগুলি একটা কাহিনির সূত্র ধরে এগিয়ে চলে। আবার চরিত্ররা যখন দ্বিতীয়বার পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তু হয় তখন দীপেন্দ্রনাথ তাদের চেতনাকে নাড়া দিয়ে বিপ্লবের ডাক দেন। যেমন, ডাক গল্পে দাঙ্গা, মারামারি, বিভেদ প্রভৃতির সীমানা পেরিয়ে উত্তরণের 'ডাক' দেন, 'শঙ্খ' গল্পে উদ্বাস্তু মানুষের নতুন জীবন শুরু করার জন্য বিজয়ধ্বনি বাজান। 'মুক্তি' গল্পেও চরণ প্রথমে বিশ্বপ্রকৃতির কাছে মুক্তি চায়, পরে বিশ্বমানবের কাছে মুক্তি চায়। অনেকটা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মুক্তির সঙ্গে মিলে 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'। অপরদিকে দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, নতুন কলোনিতে বসবাস প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রফুল্ল রায়ের যে গল্পগুলি তাতে পটভূমি বিরাট কিন্তু এসবের বর্ণনা নেই। পরিবর্তে আছে দেশবিভাগের পরবর্তী দীর্ঘদিন পর যখন সবকিছু দাঙ্গা, বিভেদ স্থিত, যখন মানুষজন শান্তিতে বসবাস করছে নিজের বাস্তুভিটে ছেড়ে অন্য এক দেশে। দীর্ঘদিন পর নিজের বাস্তুভিটে, আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুল হয় এবং বিহ্বল হয়ে পড়ে। আর দেবেশ রায় দেশভাগের গভীর, কঠিন, শরীরচ্ছেদী অভিজ্ঞতাকে গল্পে

নতুন আঙ্গিকে আকার দেন। দেশবিভাগের বিপন্নতায় তাঁর চরিত্ররা নিজেরই গভীরে খোঁজে দগদগে এক ক্ষতস্থান। চরিত্ররা নতুন করে বেঁচে থাকতে পারছে না। নতুন কলোনিতে মাস্তান, গুণ্ডা, স্বার্থলোভী নেতাদের অত্যাচারে তারা আবার উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। যখন, 'উদ্বাস্তু' গল্পে সত্যব্রত আর অণিমা আত্মপরিচয়হীন এক উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। হিন্দু-মুসলিম যেই হোক না কেন নতুন করে নতুন দেশে নতুন স্বপ্ন দেখতে যারা এদেশে এসেছিল তারা এদেশে এসে পূর্বকল্পিত ভাবনার সঙ্গে মেলাতে পারছিল না। এখানেও একই পরিস্থিতিতে তারা জাতি-বর্ণের বিভাজন রেখার কবলে পড়ে। তাই শেষ পর্যন্ত 'জননী! জন্মভূমি!! গল্পের কথক আত্মহননের পথ বেছে নেয়। কিন্তু গল্পকার দেশভাগের সময় থেকে উঠে পড়া একটি মানবিক প্রশ্ন কথকের মাধ্যমে পরিণামী প্রতিবেদন হিসাবে তুলে ধরেন—

> ''আত্মহত্যার সময় আমি এই বুকটাকে দুই ভাগ করে একটা ডাবল-ফুলস্ক্যাপ সাইজের ব্লটিঙ কাগজে হৃৎপিণ্ডের ও রক্তের দাগ তুলে দেব। আমার রক্তের বিচ্ছেদ রেখাটিকে বের করতে সেটাও জাতিপুঞ্জে পাঠানো হবে।''[১৫]

স্বাধীনতা-উত্তর কালের বাংলা ছোটগল্পে রাজনীতি নানা তাৎপর্যে গল্পের প্রসঙ্গ এবং প্রকরণে শিল্পরূপ পায়। দেবেশ রায় তাঁর গল্পে রাজনীতির সংজ্ঞা এবং স্বরূপ বদলে দেন—

> ''রাজনীতি মানে ত আমাদের এই দৈনন্দিনের ভিতর এক স্বপ্নের সঞ্চার, তারপর স্বপ্নকেই দৈনন্দিন করে তোলার ইচ্ছে আর কাজ। স্বপ্ন যে দেখতে পারে, সে যে নিজের সেই স্বপ্ন নিজের ভিতর সঞ্চারিত করতে পারবে, তা সব সময় হয় না। স্বপ্নেরও ত রাজনীতি থাকে। কিন্তু যদি কেউ স্বপ্ন সঞ্চার ঘটাতে পারে, ইচ্ছেরও ত রাজনীতি থাকে। আর, যদি ইচ্ছে তৈরি হয়, বা নাই হয়, তা হলেও কর্মের ব্রত সকলে নাও নিতে পারে। স্বপ্ন থেকে কর্ম পর্যন্ত এই পুরো প্রক্রিয়ার যে-কোনো একটি অংশই রাজনীতি।''[১৬]

তাঁর হাতে রাজনৈতিক আখ্যানের নতুন একটা সংজ্ঞা তৈরি হয়। রাজনৈতিক গল্প-উপন্যাস বলতে যা বোঝায়, তার সঙ্গে তাঁর গল্পের কোনো মিল নেই। রাজনীতির এই কল্পনা দেবেশ রায় বাল্যকালেই আয়ত্ত করেছিলেন দাদা দীনেশচন্দ্রের আদলে। স্বাধীনতার সময় থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি তার ছোট্ট মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তীকালে তিনি ঘোরতর ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর প্রথম দিকের গল্পে রাজনীতির কোনো ছোঁয়া নেই। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন—

> ''১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সাল আমি একেবারে রাজনীতিতে ডুবে ছিলাম, রাজবংশী সমাজের মধ্যে রাজনীতি করতে হত। প্রধানত কৃষক আন্দোলন, তাছাড়া পার্টি সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন— নানাভাবে। যাকে আঞ্চলিক নেতৃত্ব বলে, সেই রকম নেতা হিসেবেই আমাকে কাজ করতে হত।''[১৭]

দেবেশ রায়ের প্রথম রাজনীতি সচেতন গল্প 'ক্ষয় ও তার প্রতিকার'। গল্পের প্রধান চরিত্র তখন। বাড়ির কাউকে কিছু না বলে ভিতরে ভিতরে বিপ্লবী দলে নাম লেখায়। তার দিদি টি.বি. রোগে আক্রান্ত। অস্পৃশ্যতার কারণে সে নিজের বাপের বাড়িতে ঠাঁই নেয়। তখন হঠাৎ কোথা থেকে এসে দিদির কাছে দশটা রুটি চায়। দিদি কারণ জানতে চাইলে তপন উত্তর দেয়—

> ''ঐ চরে এক জমি নিয়ে খুব গোলমাল হয়েছে। কৃষকেরা চাষফাষ করেছে, তারপর বোধ হয় কে জোতদার গেছে দখল নিতে। তারপর মারামারি। একজন কৃষক বোধহয় মারা গেছে।''[১৮]

এর ফলে কৃষকরা প্রতিবাদ স্বরূপ মিছিল-মিটিং বের করে। তাদেরই জন্য রুটির দৃশ্য মালায় পরিবারের সকলে এক হয়ে যায় জনকল্যাণের বন্ধনে। গল্পটিতে রাজনৈতিক বিশ্বাসের এক ইতিবাচক দিক প্রকাশিত হয়েছে। 'উদ্বাস্তু' গল্পে দেখা যায় ক্ষমতায় আসীন প্রশাসন কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে দেয়। ভণ্ড রাজনীতির বেড়াজাল আবদ্ধ সাধারণ মানুষ নিজের পরিচয়-লিপির প্রমাণ দিতে পারে না। 'বটা সান্যালের অন্তর্দ্বন্দ্ব' গল্পে রাজনীতির চিত্র সরাসরি ফুটে উঠেছে। মিটিং, মিছিল, ভোট—সবকিছুর প্রসঙ্গ আছে।

উপেন নাপিত নির্বাচনের সময় কমিউনিস্ট ছিল, পরে সে কমিউনিস্টদের চোর-ডাকাত বলতে থাকে আর নিজেকে সে কমিউনিস্টদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কংগ্রেস ভাবতে থাকে। সে বলে—

> ''কংগ্রেসের মধ্যে যদি প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট থাকতে পারে, কমিউনিস্টদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কংগ্রেস থাকতে পারবে না কেন? আমি কমিউনিস্টের মধ্যে সেইরূপ প্রচ্ছন্ন কংগ্রেসি ছিলাম, নির্বাচনের সময়—''[১৯]

'রাষ্ট্রপতির শাসনে' গল্পে রাষ্ট্রীয় রাজনীতির বলিতে তিস্তার চরের দশ হাজার সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব নেই। তিস্তার চর সরকারের খাস মহলের অন্তর্গত। সেখানে যদি কেউ বাড়ি-ঘর তৈরি করে বসবাস করতে চায় তাহলে তাদেরকে সরকারের লাইসেন্স নিতে হয়। বিনা অনুমতিতে বসবাসের জন্য খেকমণি ওরফে খেকি ও তার স্বামী রামগোপাল সহ তিস্তার দশ হাজার লোকের কোনো সরকারী প্রমাণপত্র নেই। তারা যেমন নিজেদের অধিকার আদায় করতে পারবে না, তেমনি জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় নিজের অস্তিতও প্রমাণ করতে পারবে না। 'জয়যাত্রায় যাও হে' গল্পে রাজনীতির চরম বিপর্যয় লেখক দেখিয়েছেন—মিছিল, মিটিং, শ্লোগান, হরতাল, সমসাময়িক পুরনো সরকারের ভাঙন, আবার অন্য পার্টির নতুন সরকার গঠন ইত্যাদি। আকুলুদ্দিন এবং নারান মল্লিক—দু'জনেই যেমন দুই বিপরীত ধর্মের মানুষ, তেমনি দুই বিপরীত রাজনীতির মতাদর্শে বিশ্বাসী। দু'জনেই দুই ভিন্ন দলের নেতা। তারা হিন্দু-মুসলিম, দেশি-ভাটিয়া প্রভৃতির বিরোধিতায় জর্জরিত। দু'জনেই রাতের অন্ধকারে বিপরীত দলের হাতে খুন হওয়ার ভয়ে ঘুরপথে তাঁদের গন্তব্যে চলতে থাকে। দু'জনেই একসময় রাতের অন্ধকারে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। যদিও তাদের পারস্পরিক আক্রমণাত্মক ভঙ্গি ছিল, তবুও তারা কেউ কিছু করতে পারে না। তারা দু'জনেই চায় কৃষকদের জন্য ন্যায্য দাবি আদায় করতে। কিন্তু তারা বুঝতো দু'জনে সৎ হলেও তাদের দলের অন্যান্যকর্মীরা দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন। তাই তাদের একসাথে দাবি জানাবার দিন শেষ হয়ে গেছে। 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' গল্পের নায়ক মিঠু, রাজনৈতিক দলের একনিষ্ঠ সদস্য। মারামারি, খুনাখুনি তার প্রায় নিত্য দিনের কাজ। একটা খুনের কেস-এ সে তার পাঁচ সঙ্গীর সঙ্গে ধরা পড়ে জেলে যায়। জেলে থাকাকালীন সময়ে প্রকৃতিকে খুব কাছ

থেকে দেখে, ভালো করে ঘুমোবার সময় পায়, যা সে জেলের বাইরে থাকতে পায়নি। এই ভাবে মিঠুর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। আপ্রুভার হতে রাজী না হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ তাকে মুক্তি দেয়। পুলিশ এও বলেছে, সে যেখানেই থাকুক না কেন পার্টির মিটিং-মিছিল পর্যন্ত পুলিশ তাকে রক্ষা করবে। নিষ্ঠাবান পার্টির সদস্য মিঠু কোনোমতেই পুলিশের এইসব ব্যাপার সমর্থন করতে পারে না। তাই সে জেল থেকে বের হয়ে পার্টি অফিসে যায় এবং সেখানে সবার সামনে আত্মরক্ষার সাহায্য চায়। পার্টি এবার চব্বিশ ঘন্টা তার জন্য রক্ষীর ব্যবস্থা করে দেয়। পার্টি এবং পুলিশের অদৃশ্য পাহারায় মিঠু আরও বেশি করে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এবং এক মাঝরাতে সে আত্মহত্যা করে। সে পুলিশের রাজনীতি এবং দলীয় রাজনীতির বলি হয়।

উপরিউক্ত গল্পগুলি আলোচনার মাধ্যমে দেখা যায়, দেবেশ রায়ের গল্পগুলিতে রাজনীতি সচেতনতা একটা প্রধান বিষয়। তাঁর গল্পের রাজনীতি সচেতন চরিত্ররা অধিকার বা প্রাপ্য বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আবার এমনও অনেক চরিত্র আছে যারা রাজনীতির কবলে পড়ে নিজেদের অধিকার আদায় করতে পারে না। নিম্নবর্গের চরিত্ররা বেশিরভাগই রাজনীতির শিকার হয়েছে। যেমন—'রাষ্ট্রপতির শাসনে' গল্পে খেকমণি এবং তার স্বামী রামগোপাল নিজেদের অধিকার আদায় করতে পারেনি। আবার রাজনীতির আদর্শকেই আজীবন বুকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে ছিলেন 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' গল্পের মিঠু।

সাতের দশকের প্রথমদিকে ১৯৬২ সালে যখন দেবেশ রায় তাঁর জীবন ও কর্মের বোধে দৃঢ় এবং ভবিষ্যৎ কর্মে প্রস্তুত সে সময় চিনের ভারত আক্রমণ ও ১৯৬৪-তে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন ধরে। এই সময় বিভিন্ন লেখক রাজনীতির আবহে তাঁদের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি লেখেন। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫৬-১৯৬২ সালের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি লিখলেও পরবর্তীতে ১৯৬৭ সালে একটি রাজনৈতিক ছোটগল্প লিখলেন 'হওয়া না হওয়া'। গল্পটি ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙে দেওয়ার পরে, রাষ্ট্রশক্তির প্রতিহিংসার বিরুদ্ধে বামপন্থী গণজাগরণের তুঙ্গ মুহূর্তে লেখা। সে সময় রাজ্যে ছোটোখাটো দাঙ্গা চলছিল। বিভিন্ন বিশৃঙ্খলার ফলে আগস্ট মাসে পরিস্থিতি গুরুতর হয়। যুক্তফ্রন্টের আহ্বানে ও রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির সমর্থনে রাজ্যে সাধারণ ধর্মঘট পালিত

হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ হঠাৎ মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীও ক্ষুব্ধ হয়ে পদত্যাগে উদ্যত হন। দেবেশ রায়ও অনুরূপ কাহিনির গল্প লেখেন 'জয়যাত্রায় যাও হে'—''অজয় মুখার্জিটা সরকারটা ভাঙছে, আমরা ধরছি, তরা আমাদের সাপোর্ট করস নাই কেন। তয় ত সরকারটা থাইকত।''[২০]

১৯৬৭ সালেই সি.পি.আই. (এম) দলের একাংশ পার্টির নেতৃত্বে বিরুদ্ধে শোধনবাদী সংসদীয় পথ অনুসরণের অভিযোগ আনে এবং নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের পথে দেশ থেকে শোষণ মুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এর ফলে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয় এবং পরস্পর ভ্রাতৃহত্যার রাজনীতিতে মেতে ওঠে। এই রাজনৈতিক অস্থিরতার পটভূমিতে দীপেন্দ্রনাথ লেখেন 'শোক মিছিল' গল্পটি।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'নীলুর দুঃখ' গল্পের নায়ক নীলু খুনাখুনির রাজনীতির শিকার। পোগো নীলুকে খুন করতে চায়, কিন্তু পারে না। পোগোও নিঃসঙ্গ রাজনীতির শিকার। সময়ের নিঃসঙ্গতার শিকারে নীলুও পোগোর মতো খুন করতে চায়, কিন্তু যে তীব্র ইচ্ছা নিয়ে এগিয়ে যায় সে আবেগ কমে গেলে নীলুর মনে অবসাদ আসে। এই নীলুই শেষ পর্যন্ত পাগলা খুনী পোগোকে সিগারেট খাইয়ে নিজের মনের দুঃখের কথা বলে। প্রথম প্রেমের বিচ্ছেদের গল্প পোগোকে বলে যায়, পোগোও নিবিষ্ট মনে বুঝার চেষ্টা করে। রাজনীতির রক্তাক্ত পরিবেশ থেকে নীলুর এক উত্তীর্ণ ঘটে, রাজনীতির মুক্ত উপলব্ধি তাকে প্রকৃত জীবন উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পলাতক ও অনুসরণকারী' গল্পে যুবক রবিকে মার্জার করার জন্য তিনজন যুবক পিছনে লাগে। রবিকে খুন করার জন্য তারা রবির পিছনে কলকাতা, শ্রীরামপুর, চন্দননগর পর্যন্ত ঘোরে। যেখানে যেখানে রবি পৌঁছায়, সেখানে সেখানে তারা বোমা ফাটায়। অবশেষে রবিকে খুন করে। এরপর রবির বন্ধুরা এই তিনজন খুনীর অনুসরণকারী হয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এখানে রাজনৈতিক খুনের নিষ্ফলত্বকে বোঝাতে রাজনীতির প্রতি শ্লেষ প্রয়োগ করেছেন।

ছয় এবং সাতের দশক ছিল সেই সময়, যখন সাম্যবাদ-সচেতন ভারতীয়রা কঠিন আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। তারই ভিতর থেকে ঘটেছিল রাজনীতি-চেতনার বহুমুখী বিস্তার। রাজনীতির প্রায়োগিক রূপ অপসংস্কৃতিময় রূপেও চেহারা নিয়েছে। দেবেশ

রায়ই একমাত্র লেখক যিনি রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণের স্বরূপ পরিবর্তন করেননি। কারণ তিনি রাজনীতিকে মানব-মনীষার এক স্বপ্ন বলেই বিশ্বাস করেন। বিকৃতির অংশে তত্ত্বটির সত্যতার সন্ধান না করেও তিনি রাজনীতির ঐ আদর্শের মধ্যে খুঁজে পান মানুষের সামূহিক চৈতন্যের উত্তরণ তার পাদপীঠভূমির নিশ্চিতি। তাই রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষ তাঁর কথাসাহিত্যে এত গভীর রেখায় প্রাণবান হয়ে ওঠে।[২১]

আট এবং নয়ের দশকে বাংলা ছোটগল্প সামাজিক এবং রাজনৈতিক নানা কারণে দেশ ও সমাজের দিনপঞ্জি হয়ে ওঠে। ১৯৭৪ সালে লেখা দেবেশ রায়ের 'কয়েদখানা' গল্পটি প্রতিদিনের সংবাদ পত্রের কিছু ঘটনা নিয়ে লেখা। গল্পকার এর কাহিনিতে সাংবাদিক বাস্তবতার এক প্রতিপক্ষ বাস্তবতা হিসাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদে একটি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় দুটি সমান্তরাল সংবাদের উল্লেখ আছে—''সুপ্রিম কোর্ট মিসা আইনের ১৭ক ধারা বাতিল করে দিয়েছেন এবং আবার জেল ভাঙা, আবার সন্ত্রাস।''[২২] দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটিতে মুখ্যমুন্ত্রীর একটি মন্তব্য আছে যা ঐ দুটি সংবাদ মিলিয়ে তৈরি—''এই জেল ভাঙার ঘটনাতেই প্রমাণ হচ্ছে মিসার ১৭ক ধারার মতো বা নিবর্তমূলক আটক আইনের মতো একটি আইন কত জরুরি।''[২৩] তৃতীয় অনুচ্ছেদটিতে আবার ঐ দুটি সংবাদকে মিলিয়ে এক যুবনেতার প্রতিক্রিয়া আছে—''সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি আদালত স্তব্ধ করতে পারবে না। জয় আমাদের হবেই, কারণ লক্ষ্য আমাদের সমাজতন্ত্র, নেত্রী আমাদের ইন্দিরা গান্ধি।''[২৪] আসলে একই ঘটনা থেকে সংবাদপত্রের ' স্টোরি' ও গল্পের 'কাহিনি'র যোগাযোগের একটা প্রধান কারণ সংবাদপত্রের জগতে অনেক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের যুক্ত থাকার ফল। আবার সাহিত্যিকদের একটা বড় অংশই ঐ সময়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, মহাশ্বেতাদেবী, মতি নন্দী, সমরেশ বসু, অসীম রায় প্রমুখ সাহিত্যিকগণ দৈনন্দিনতার সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংবাদপত্র এবং সাহিত্যের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটান। তবে দেবেশ রায়ের 'কয়েদখানা' গল্পটির সমান্তরাল কোনো বিষয়গত নির্দিষ্টতা আটের দশকের পূর্বে কোনো গল্পকারের গল্পে মিলবে না। আবার সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকের দায় ও দায়িত্ব, তথ্যের উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। এরকমই এক অবস্থায় পরিচয় মেলে 'আইনানুগ ও প্রমোদকরহীন' গল্পে—

''পরের দিন দৈনিক কাগজে আবার এই সবই বেরল।... সাপ্তাহিক কাগজে আবার এই সব বেরল। কোনো-কোনো সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজ বিশেষ সংখ্যাই বের করল। সেখানেও আবার এই সব বেরল। বিশ-বাইশ বছরের দাম্পত্যের সম্পর্ককে যে সমাজ স্বীকৃতি দিতে পারেনি; আমৃত্যু সঙ্গিনীকে যে আইন একবার শেষ দেখার সুযোগ দিতে পারেনি— সেই সমাজ ও আইন এ-কে ও চন্দ্রিকার জীবনের সুন্দরতম সময়কে প্রমোদকর মুক্ত খেতে লাগল, খেয়ে যেতে লাগল, খেয়েই যেতে লাগল।''[২৫]

দেবেশ রায় গল্পসমগ্র পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকায় জানান, ছেলেবেলা থেকেই তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। স্কুলে পড়ার সময় তিনি জলপাইগুড়ির স্থানীয় কাগজ 'জনমত' ও 'ত্রিস্রোতা'য় সাংবাদিকতার কাজ করেছেন। পরবর্তীতে জলপাইগুড়িতে চাকরি করার সময়ও তিনি কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিকে খবর পাঠাতেন। আবার কলকাতায় এসে 'কালান্তর', 'প্রতিক্ষণ', 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট', দৈনিক 'আজকাল' পত্রিকায় নিয়মিত সাংবাদিক রচনার কাজ করতেন। আসলে দেবেশ রায় বলতে চান, সাংবাদিকতা এবং আখ্যানের মধ্যে মিল আছে। সাংবাদিকতার কাজ যেমন তথ্য নিয়ে, গল্প-উপন্যাসের কাজও তেমনি তথ্য নিয়ে। সাংবাদিকতা তথ্যের একটা ভিত্তি করে দিতে পারে। যে ভিত্তির উপর নির্ভর করে গল্প-উপন্যাসের তথ্যের একটা মানব দলিল নির্মাণ করা যায়। তাই দেবেশ রায় বলেন—

''আমার ক্ষেত্রে সাহিত্য আর সাংবাদিকতার মাঝখানের সীমারেখাটি অনেক সময়ই আমি অস্পষ্ট করে তুলি যাতে আমার আখ্যান সাংবাদিক হয়ে ওঠে, যাতে সেই আখ্যানের ভিতর সঞ্চরিত হয়ে যায় সাংবাদিকতার তৎপরতা, যাতে আমার ব্যবহৃত শব্দগুলি এক-একটা তথ্যে ভরাট হয়ে উঠতে পারে।''[২৬]

সুতরাং বাংলা ছোটগল্পের প্রচলিত ধারায় দেবেশ রায় সত্যিই ব্যতিক্রমী— বিষয়ভাবনা এবং আঙ্গিক দুই দিক থেকেই। রাজনীতি, প্রেম, পতিতা, সময়ের ভাঙন ও

বদল, ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা, হতাশা, মৃত্যুচেতনা, সুস্থ অস্তিত্বের অনুসন্ধিৎসা, মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত মানুষ ও তার যন্ত্রণা এবং অসহায়তা—এই সমস্তই তাঁর গল্পের বিষয়। আবার দেশিয় সমস্যা, মানুষে মানুষে অনন্বয়, চরম বেকারীত্ব, বিভেদ পন্থা ইত্যাদির চরম পর্যায় উঠে আসে তাঁর ছোটগল্পে। বীরেন্দ্র দত্ত 'বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' গ্রন্থে জানান—

> ''ছোটগল্প সাহিত্যের এমন এক শিল্প-মাধ্যম, যার মধ্যদিয়ে পাঠক নিজেকে দেখে ছোট ছোট অনুভবের উল্লাসে। এমন সব অনুভব তাকে যেমন বিস্মিত করে, তেমনি ভাবায়ও। আর এই ভাবনার মধ্যে কখনো বা কোন কোন গল্প জীবনের ও বড় উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে যায়।''[২৭]

আমাদের আলোচ্য দেবেশ রায়ও এমনি একজন ছোটগল্পকার যিনি ছয়ের দশক থেকে শুরু করে নয়ের দশক পর্যন্ত, এমনকি বর্তমানেও বাংলা ছোটগল্পের আঙ্গিকে বারবার পরিবর্তন ঘটান। ছোটগল্পের কাহিনি, পদ্ধতি, বাক্‌ভঙ্গিমা, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদিকে নতুনভাবে প্রয়োগ করেন। আবার পুরাণ কাহিনিকেও আধুনিক জীবনের সংকটের মাঝে টেনে এনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশ্লেষণ করেছেন। আসলে ছয়ের দশকে যে সমস্ত লেখক ছোটগল্পের নতুন রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এবং নতুন আঙ্গিকে ছোটগল্প লিখেছিলেন দেবেশ রায় তাঁদের থেকে যে কারণে ব্যতিক্রমী তা হল তাঁর 'চিন্তা'।[২৮] আর এর সঙ্গে যুক্ত হয় পরিবর্তিত সামাজিক বাস্তবতা। এই দুটি বিষয়ই পাঠককে পৌঁছে দেয় কাহিনির শিল্প-অভিজ্ঞতায়।

তথ্যসূত্র :

১. সৌরভ, অনিন্দ্য (সম্পাদক) : শিল্প সাহিত্য, দেবেশ রায় সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৪৪।

২. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৯৩, ভূমিকাংশ, পৃ. ১৩।

৩. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০০, ভূমিকাংশ, পৃ. ১৩।

৪. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০০, ভূমিকাংশ, পৃ. ২৩।

৫. তদেব, : পৃ. ২৪।

৬. তদেব, : পৃ. ২৭।

৭. তদেব, : পৃ. ৯৫।

৮. তদেব, : পৃ. ২৩৫।

৯. তদেব, : পৃ. ৩২।

১০. সৌরভ, অনিন্দ্য (সম্পাদক) : শিল্প সাহিত্য, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সংখ্যা, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ৯৩-৯৪।

১১. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ. ১২৮।

১২. তদেব, : পৃ. ২৯।

১৩. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৯২, পৃ. ৫২।

১৪. তদেব, : পৃ. ২২৩।

১৫. তদেব, : পৃ. ২২৬।

১৬. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র-২ দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৯২, ভূমিকাংশ, পৃ. ৩।

১৭. সৌরভ, অনিন্দ্য (সম্পাদক) : শিল্প সাহিত্য, দেবেশ রায় সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১২৯।

১৮. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৯২, ভূমিকাংশ, পৃ. ১৯।

১৯. তদেব, : পৃ. ৯৭।

২০. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৯৩, পৃ. ৩৭।

২১. চক্রবর্তী, সুমিতা : ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তকবিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৬, পৃ. ৩২২।

২২. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৩, পৃ. ১২২।

২৩. তদেব, : পৃ. ১২২।

২৪. তদেব, : পৃ. ১২২।

২৫. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র-৪, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ. ২২৭।

২৬. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র-৫, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৫, ভূমিকাংশ, পৃ. ৫।

২৭. দত্ত, বীরেন্দ্র (সম্পাদিত) : বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পুস্তকবিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ০৯, ষষ্ঠ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৬১১।

২৮. পাল, শ্রাবণী (সম্পাদিত) : বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা-বিশ শতক, অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিডন রো, কলকাতা-০৬, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৯।